না-বৈদিক হাঁ-বৈদিকের ইতিকথা

মনোহর মৌলি বিশ্বাস*

একখানি ছোট্ট নাটিকা। 'শূর্পণখা'। যার কলেবর অর্ধশত পৃষ্ঠার কাছাকাছি। অথবা সামান্য একটুখানি বেশি। অসিত বিশ্বাসের রচিত নাটিকাখানি পাঠের পর ভারতের একটা রূপ, বিশেষ করে, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যময় নারীদের জগতটা চোখের সামনে ভাসে। হিড়িম্বা, উলুসি, শূর্পণখা প্রভৃতি না-বৈদিকদের কথা যেমন মনে পড়ে, ঠিক সেই একই প্রকারে ঘোষা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি হাঁ-বৈদিক রমনীদের ঐতিহ্যময় অবদানের কথাও মনে পড়ে।

না-বৈদিক এবং হাঁ-বৈদিকদের মধ্যে একটা সংঘাত সে তো চিরকালের এক বহমানতা নিয়ে আমাদের দুয়ারে উপস্থিত থেকেছে। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। এমনকি দেশের স্বাধীনতার উত্তরকালে সত্তর বছর পরেও প্রতিভাত হয় তা। না-বৈদিক বলতে আমরা অনার্য ভারত বুঝি। সেইভাবে হাঁ-বৈদিক হল আর্য ভারত। দুই ভারতের ভিতরে একটা দ্বান্দ্বিকতা বিদ্যমান। বৈষম্যজনিত সেই দ্বান্দ্বিকতা শিক্ষায়, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে আর অর্থনীতিতে।

সে কালে যা ছিল একালেও তা আছে। রবীন্দ্রনাথ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন বিষয়টি। ব্যথিত চিত্তে গাইলেন মিলনের গান—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনী
সব অপমান ভার।[১]

অনার্য ভারত অনাদিকালের এক পুরাতন দেশ। অর্যদের আগমনের বহু আগে থেকেই সে তার নিজস্ব গরিমায় ছিল সমাচ্ছন্ন। ভারতে আর্যদের আগমন নিয়ে দুটি ভিন্ন মত আছে। দীর্ঘকাল ধরে ঐতিহাসিকেরা বলে আসছিল, আর্য-সভ্যতার মানুষ মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমের খাইবার পাশ গিরিপথ দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করেছে এবং বাসিন্দা হয়েছে ভারতের। তারা মূলত যাযাবর শ্রেণির মানুষ। পশুপালন ছিল মূল জীবিকা। গো-পালনে তাঁদের সবিশেষ ভূমিকা। গো-মাতার পূজা-পালনে তাদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। আর্যরা যে বিদেশী, বর্তমান তার একদল ঐতিহাসিক তা অস্বীকার করে থাকেন। তাঁদের অভিমত আর্যরাও ভারতবাসী এদেশের মূল বাসিন্দাদের মধ্য থেকে এক দল মানুষ শিক্ষায় ও সভ্যতায় অগ্রসরতা লাভ করে। তাদেরই একদল মুনি-ঋষি রচনা করে বেদ। তারা বেদপন্থী। হাঁ-বৈদিক। আর্যরা ভারতেরই অথবা বাইরের দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে, তা নিয়ে বিতর্ক অনাবশ্যক।

আর্যরা যে হাঁ-বৈদিক তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আর্য মুনি-ঋষিরা যে বেদের রচয়িতা তা নিয়েও দ্বিমতের জায়গা নেই। অনার্য ভারত বহুকালের পুরাতন। আর্যদের আগমনের উত্থানের পরে অনার্য ভারত ধীরে ধীরে আর্য ভারতের অঙিনায় পা রাখতে শুরু করে। উত্তর ভারততেই আর্যাবর্ত নামে খ্যাত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত অনার্য ভারতের গরিমার প্রাবল্যে এখনও অনেকটা স্নাত। আর্যরা তাঁদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ বেদ নিয়ে সে কথা এ নিবন্ধে আগেও বলা হয়েছে। এসেছিল বলেই সেই উত্তর ভারতে আর্যাবর্ত গড়ে উঠেছে। সেখান থেকে মূলনিবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বৈদিক প্রচার ও প্রভাব বিস্তার ঘটে স্বাভাবিক নিয়মে। অনেকটা জোর জবরদস্তি ছিল।

ভারতের মূলনিবাসীদের সভ্যতাও ছিল উন্নত। প্রাচীন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টেগোমারী জেলার হরপ্পাতে খনন কার্যের দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছে এক উন্নত নগর সভ্যতা। "Archaeological excavations carried on at the site have revealed ruins of a well planned a city containing granaries, workmen's qauartes, citadel with gates and terrases and cemetaries along with many seals which have not yet been deciphered and other objects bearing evidence, to the existence there of an advanced types of civilization"[২]

ভারতের মূল নিবাসী মানুষের এই উন্নত নগর সভ্যতা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। হরপ্পা সভ্যতার মত সিন্ধু প্রদেশের লাড়কানা জেলায় মহেনজো-দারোতেও বিদ্যমান ছিল মূলনিবাসীদের আরেকটি নগর সভ্যতা। সিন্ধু নদ উত্তর-পশ্চিম ভারতকে তার পঞ্চ কন্যার জলধারার আশীর্বাদ দিয়ে করেছে শস্য-শ্যামলা। সেই পঞ্চ কন্যারা হল

ঝিলাম, চিনাব, রবি, শতদ্রু সোর্তলেজ ও বিপাশা। সভ্যতার গড়নে প্রকৃতির আশীর্বাদ বড় ভূমিকা পালন করে যেটা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুটি সভ্যতারই নির্মাণকাল স্থিরীকৃত হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের মধ্যে। "and (it) is believed to have flourished earlier than the Vedic civilization of the Indo-Aryans who probably entered into India after the tall of Indus Velley civilization the cause of decline and fall of which is not known"

এখানে ঐতিহাসিকের ভাবনায় একথা স্পষ্ট। অনার্য সভ্যতা আর্য সভ্যতার থেকে প্রাচীন। এবং আর্যরা বাইরের থেকে ভারতে এসেছে। যারা বলে আর্যরা বাইরের থেকে এসেছে, তাদের কাছে আর্যরা বিদেশী। আবার, যারা এই মূহূর্তে বিভিন্ন ভাষাভাষি ও ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের কথা না ভেবে ভারতবর্ষকে 'হিন্দু ভারত' নির্মাণের কথা বলে, তারা মানুষের বহুত্ববাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাকে নস্যাৎ করে একটা একমুখী ধর্ম-যাত্রা ঘটাতে চায়। ভারতের বর্তমান রাজনীতির ময়দান সে কারণে অনেকটা অশান্ত হয়ে উঠেছে। সেইরূপ একটা পরিস্থিতি সামনে রেখে 'শূর্পণখা' শিরোনামের ছোট নাটিকার জন্ম হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায়।

যারা 'হিন্দু ভারত' নির্মাণের কথা বলে তারা বোধকরি আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছে তা মানে না। তাদের ভাবনার পিছনেও যুক্তি আছে। কি সেই যুক্তি ? চারখানি বেদ নির্মাণে যারা অংশ গ্রহণ করেছে তারা আপাত দৃষ্টে সবাই ভারতীয়। আর্যরা বহির্ভারতে বসে বেদ নির্মাণ ক'রে সেই বেদ নিয়ে ভারতে এসেছিল তা কোনো যুক্তিতে গ্রহণ যোগ্যতা পায় কি? ইতিহাস পাঠকদের মধ্যে এতকালের বিশ্বাসে ধাক্কা লাগল ঠিকই। অমান্যতায় দূরে ছুড়ে ফেলাও গেলনা বিষয়টি। বেদপন্থীরা বেদের হাত ধরে অন্য একটা বিষক্রিয়ার বীজ ভারতের মাটিতে পুঁতে দিল। যে ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল না, যে ভারতবর্ষে বর্ণ ভেদছিল না; সেখানে জাতিভেদ-বর্ণভেদের জন্ম হল বেদের হাত ধরে। ঋক বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত নব্বই-তম সূক্তের দ্বাদশ ঋকে বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত নব্বই-তম সূক্তের দ্বাদশ ঋকে জন্ম হল মানুষে মানুষে বিভাজন।[৫] মানুষের মধ্যে স্থান পেল উত্তম বর্ণ ও অধম বর্ণ। পেশাগতভাবে উত্তম মানুষ ও অধম মানুষের উল্লেখ আছে। প্রথম তিন বর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) স্থান পেল উত্তম বর্ণে। এবং চতুর্থ বর্ণের মানুষ শূদ্ররা হীন পেশায় নিয়োজিত থেকে উত্তম বর্ণ তিনটির সেবা করবে এমন ভাবনাও গড়ে উঠল তখন।

না-বৈদিক ও হাঁ-বৈদিকদের মিলনের পথে প্রবল বাধা থাকা সত্ত্বেও দু'য়ের মিলন একান্ত জরুরি। এই সময়ের এক দলিত কবি মিলনের স্বপ্ন দেখলেন তাঁর কবিতায়। বেদভাষ্যের অনুবর্তী হলে দলিতদের লেখা পড়া শেখার কথা নয়। বৈদিকতার আদর্শে বিশ্বাসী হলে সে কখনো প্রভুত্বের আসনের দিকে হাত বাড়াতে পারে না। পারে না উচ্চাশা করতে। পারে না জীবন ও জীবিকায় স্বচ্ছলতা আনতে। পঙ্কিলতার আবর্জনায় নিমজ্জিত থাকার কথা তাঁর। না, এ কবি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ছাত্র। প্রথম শ্রেণির ইঞ্জিনীয়ারও

বটে কবি হয়ে কবিতা লেখার কাজে বিসর্জন ছিলেন। নিজের জীবনের বড় চাকরির মোহ। গাইলেন বেদ-বিরোধী হয়ে মিলনের গান:

ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;
তবুও সব বৃক্ষ আর পুষ্প কুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।[৬]

শূর্পণখা এক না-বৈদিক কন্যা। আর্যদের মতো আচার-ব্যবহার তাঁর থেকে প্রত্যাশা করা অনুচিত। রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার ভিতরে সে গরিমা নেই। নেই অহঙ্কার। মানুষে মানুষে বিভাজন, মানুষে মানুষে ছোট-বড়র ধারণা তাঁর মনে স্থান পায় না। পিত্রালয়ে থেকে, বরং বলা ভালো, প্রবল প্রতাপান্তিত্য রাজাধিরাজ লঙ্কাধিপতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের রাজপুরীতে থেকে কর্ণ কুহরে এক ভয়ানক দুঃসংবাদ পৌঁছায় তাঁর। কি সেই দুঃসংবাদ? সে না-বৈদিক, সে অনার্যা, সে অনার্য কালকেয় জাতিগোষ্ঠীর রাজকুমারের পত্নী, কালকেয়দের রাজকুমার বিদ্যুৎ জিহব তাঁর প্রেমের পুরুষ, ভালবাসার সম্পদ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজপুরীতে থেকেই খবর পেল তাঁর প্রিয়তম স্বামী বিদ্যুৎ জিহব নিহত হয়েছে এক যুদ্ধে। কে করল যুদ্ধ? কোথায় হল সে যুদ্ধ? দিকবিজয়ে বেরিয়ে ছিল মহামহিম রাজা — তারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ। কালকেয়দের সেনাদল বাধা দিল রাবণকে। রাবণও যেমন জানত না বীরবিক্রমে যে যুবকটি যুদ্ধ করছে সে আর কেউ নয়, সে তাঁরই ভগ্নী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎ জিহব, বিদ্যুৎ জিহবও জানত না সে মুখোমুখি যুদ্ধ করছে তার প্রেয়সীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে। অঘটন যখন ঘটে সে বড় অজান্তেই ঘটে। যে অঘটন নিজের বোনের স্বামীকে নিজে হাতে হত্যা করে এবং বিধবা করে দেয়, আপন আদরের বোনকে; তা কি কঠোর কঠিন পাষাণ হৃদয় রাবণকেও ভাসিয়ে দেয়নি অশ্রুজলে? তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। যারা সেই মুহূর্তে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল রাবণকে তারাই সাক্ষ্য হয়ে আছে কিভাবে পাষাণ হৃদয় গলে গিয়ে অশ্রুর প্লাবন বইতে পারে। চোখের জলে বক্ষপীঞ্জর ভেসে গেছে তাঁর। হাউ হাউ করে কাঁদছে রাবণ বিদ্যুৎ জিহবকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে। বলছে, 'কীভাবে তোকে শান্ত্বনা দেব বোন, সে ভাষা আমার হৃদয়ে জমা নেই। আমি অসহায়, মূঢ়, ম্লান, মুক বদনে এখান থেকে ক্ষমা চাই তোর কাছে। অকাল বৈধব্যে; যন্ত্রণা তুই কীভাবে বইবি বল? সেও আমার জানা নেই।'

প্রকৃতির সবুজ শোভায় মনোমুগ্ধকর আমার সুশীতল দণ্ডকারণ্যের অরণ্যভূমি। অনেক শ্বাপদ জীবজন্তুও বাস করে সেখানে। প্রকৃতির শোভা তোর হৃদ-যন্ত্রণা ভুলতে অনেক সাহায্য করবে। খর আর দুষণকে পাঠাব সাথে। তারা থাকবে তোর দেহরক্ষী। অষ্ট প্রহর তারা চোখে চোখে রাখবে তোকে। আমি যে অনৈতিক ও নিষ্ঠুর কাজ করেছি তার তো কোনও প্রায়শ্চিত্ত হয় না। একবার দণ্ডকারণ্যে গিয়ে হৃদয়টাকে সামলে নে তোর, বোন। অনেক দূর থেকে কোনও এক সময়ে রাবণ তাঁর যাত্রাকাল প্রত্যক্ষ করেছিল। অনার্যরা

চিরকাল সাদাসিদে। শ্রমশীলা যেখানে বসবাস করে প্রকৃতির সাথে লড়াই স্থায়ী হয়ে থাকে। আর্যদের মত শ্রমবিমুখ যেমন নয় তাঁরা, পরান্নভোজীও নয়। ভারতবর্ষকে তারা দান করেছে অনেক কিছু। "আদিম শ্রেণীহীন সমাজের আর্থিক অবস্থার ভিতর হইতে প্রথম সংস্কৃতির উদয়। ভাষার প্রচলন, শিল্পকলার উৎপত্তি, ম্যাজিক ও ধর্মের সূচনা, লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার — এগুলি হল সে-সংস্কৃতির প্রধান চিহ্ন। ইহার সকল গুলিতেই সেকালের আর্থিক জীবনের ছাপ স্পষ্ট রহিয়াছে। শিকারের সময়ে হাত পায়ের সাহায্যে সংকেত, জন্তুদের ভয় দেখানো বা ভুলাইবার জন্য গলার আওয়াজ, হাতিয়ার তৈয়ার করিবার কৌশল পরস্পরকে শেখানো — এই সব ব্যাপারে ভাষার আরম্ভ হয়। মানুষের বুদ্ধি গড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। হাতিয়ারের সুন্দর গড়নের মধ্যে মনে হয় শিল্পের জন্ম।"[৭] প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের এই অভিমত হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। অরণ্যবাসীদের সেদিক থেকে সম্ভ্রম জানাতেই হয়। হাঁ-বৈদিকের উল্টোপথের যাত্রা না-বৈদিকদের। না-বৈদিকেরা যাগযজ্ঞে বিশ্বাস করে না। হাঁ-বৈদিকেরা মূলত প্রথম থেকেই আধিপত্যকামী। অন্যের ওপরে প্রভুত্বের পথ বেছে নিয়েছে। যে ভারতে জাতিভেদ ছিল না, বর্ণভেদ ছিল না সেই ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষকে ভেদাভেদের পথে নিয়ে গেছে তাঁরা। যে মানুষেরা মূলত সাম্যবাদী, যে মানুষেরা মূলত সমতায় বিশ্বাস করে, কখনো কারো ধ্বংস কামনা করে না; তাদের ভিতরে বৈষম্যের বীজ বহন করেছে শত সহস্র ব্রাহ্মণ শ্রেণির, শত সহস্র মুনি-ঋষি নামধেয় মানুষের অবদান দিয়ে রচিত বেদ। এবং বেদকে বাস্তবে রূপদান করার সহায়ক — অজস্র সহায়ক গ্রন্থ। এবং সেগুলি হল মূলত মনু সংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা সহ প্রায় শতাধিক সহায়ক গ্রন্থ। তাঁরা জাতিভেদ নিয়ে বর্ণভেদ নিয়ে বীজ বপন করেছে অসাম্যের। এমনকি অস্পৃশ্যতার জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে। "জন্মগত অসাম্যের তত্ত্ব ও বিশ্বাস এবং তার ভিত্তিতে রচিত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মূলত কোনরকম বিশ্বজনীন এবং মানসিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। জাতিভেদ, বিশেষত অস্পৃশ্যতা শুধু যে আমাদের সমাজকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত করে রেখেছে তাই নয়, আমাদের চৈতন্যের পরিধিকেও রেখেছে অত্যন্ত সীমিত করে।"[৮] বলতে কোনও দ্বিধা নেই জাতিভেদ (যা মূলত ঋক বেদের অবদান) শ্রেণিভেদের জটিল ভারতীয় রূপ। মার্কশীয় ভাবনার শ্রেণি সংগ্রামের প্রয়োগে তার সমাধান হবে না। হবারও নয়। হৃদয়ের অন্দর মহলে পরিবর্তন না এনে সমতার কথা বলা পরিহাসের সমতুল্য। সংস্কৃতিক বিপ্লব (cultural revolution) পারে তা করতে। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হতে পারল ভারতে পারল না কেন? রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকে তার নাগরিকদের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের যোগান দেবার। তার কথা আর্য-ভারতের মাটিতে আর জায়গা পেল কোথায়! ফলশ্রুতিতে দরিদ্র দরিদ্রই থেকে গেল, নিরক্ষর নিরক্ষরই থেকে গেল, গৃহহীন গৃহহীনই থেকে গেল। অন্নবস্ত্রের অভাবে যারা ভুগছিল তারা সে অভাবকে সঙ্গী করে নিল জীবনের।

শূর্পণখা এই ভারতবর্ষের মূলনিবাসী এক রাজপরিবারের দুহিতা। তার চরিত্রে মিশে

আছে শিশুসুলভ সারল্য। উঠতি যৌবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির লগ্নে সে হারিয়েছে স্বামীকে। যত তাড়াতাড়ি পারে সে ভুলতে চায় অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা। আদিবাসী সমাজে বিধবা-বিবাহ চিরকালের এক প্রচলিত প্রথা। স্বামীর মৃত্যুর কারণও জানা তার। তার মৃত্যুর কারণ তারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ। সে এও জানে এবং বিশ্বাস করে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ তো না চিনতে পেরেই হত্যা করেছে তার স্বামীকে। বিদ্যুৎ জিহবয়ের মৃত্যুর জন্য তাই কোনও অভিশাপের কাঠগোড়ায় দাঁড় করায় না রাবণকে। হাঁ-বৈদিকেরা ক্রোধকে ব্রাহ্মণ্য তেজের অঙ্গ বলেই পরিগণিত করে। কথায় কথায় অভিশাপ দেওয়াটা জীবনের অঙ্গ হয়ে যায় তাঁদরে। এখানে বোনের ভালোবাসা থেকে রাবণ বঞ্চিত হয় না যেমন, রাবণও ভাবতে শুরু করে বোনের কথা। তার সাম্রাজ্য দণ্ডকারণ্য। সেখানে বর্তমানে কোনও রাজা নেই। রাবণ তার বোন শূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যে রাণী করে পাঠায়। খর আর দূষণকে পাঠায় তার নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে। খর আর দূষণ আপন দু-ভাই "রাবণের অবধানতার ফলে ভগিনী শূর্পণখার স্বামী নিহত হলে, বিধবা ভগিনীকে খরের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় রাবণের আদেশে খর চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রভু এবং শূর্পণখার রক্ষক ও আজ্ঞাবহ হয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে থাকে।"[৯] অনার্যা রমণপদের রাক্ষসী বলা হয়েছে অনৈতিক ভাবে। অকল্পকল্পিত এক বিন্যাস হিসাবে। বর্তমানকার দলিত সাহিত্য ও লেখকেরা উল্টোরথের যাত্রাটা কীভাবে করতে হয় সেই পথটাই তো দেখিয়ে দিচ্ছে সকলকে। এক গুজরাতি দলিত কবির কথা মনে পড়ে, কী বলেছে সেই কবি?

When you call me untouchable
I am offended
And wish to slap you on the face
When you call me harijan
I am humiliated
And I wish to spit upon your back.[১০]

দলিত কবির বিদ্রোহ আর্য অভিভাষণের বিরুদ্ধে। দলিত কবির বিদ্রোহ আর্য-অহঙকার ও আধিপত্য প্রতিস্থাপনের বিরুদ্ধে। "of the various modern Indo-Aryan languages or groups of dialects, some have been quite important and dominant as literary languages or as language of inter-provincial intercourse from very early times, while others have been nothing but forms of local pato is."[১১]

আর্যরা তাঁদের ভাষার আধিপত্য নিয়ে দখল করেছে ভারতীয় সভ্যতা। মানসিকভাবে পরাজয়ের শিকার হয়েছে অনার্য জনগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের রাক্ষস, দানব, অসুর, দাস, দস্যু বলে বর্ণনা করলেও তারা ক্ষেপে উঠেনি। প্রবল প্রতিবাদ করেনি, প্রবল বিদ্রোহ করেনি। কালের অভিঘাতে কেবল ব্রাত্য হয়েছে। "The Aryans of the Vedic cults called these non-Vedic aryans `Vratyas' outcasts, or riteless people."[১২]

রাবণ ছিল শক্তিশালী রাজা। তাঁর অমিত তেজ ও বাহুবল ছিল বলেই বোন শূর্পনখার

বৈধব্যের যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব করে দিতে পেরেছিল। দণ্ডকারণ্যে রাণী বানিয়ে দিয়ে।

পক্ষান্তরে লক্ষ্য করি হিড়িকা ও উলুপির জীবন। অনার্য ঘরের কন্যা হয়েও আর্য-ঘরের বধূ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের। তাঁরা কি আদৌ সুখি ও সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিল? সুবোধ ঘোষ তাদের কথা বলেছে এইভাবে ঃ

"ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সংঘটন হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের সন্ধান আমরা পাই না, যাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ভারতের আদিবাসীকে আর্য ভারত আপন করে নেবার চেষ্টা করেছে। বীর পার্থ আদিবাসী দুহিতা উলুনীকে এবং মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর হিড়িম্বাকে সাময়িকভাবে সহচরী রূপে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেননি। ইন্দ্রপ্রস্থ বা হস্তিনাপুরের আর্য গরিমায় ফিরে এসে তাঁরা নির্বাসিত জীবনের সুখি সহচরীকে ভুলে গিয়েছিলেন। আর্য ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজও সেই ব্যবধান দূর হয়নি। আর্যয়ানার মধ্যে একরকম জাতিগত ঔদ্ধত্য আছে। আধুনিক ভারতবাসী বুদ্ধির দিক দিয়ে উদারনীতিক হলেও এই বুনিয়াদি জাতিগর্ব (Race-pride) তার রুচিকে অজ্ঞাতসারে গ্রাস করে আছে। উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষ নতুন সাহিত্য শিল্প ও সমাজ সংস্কারের ভারতবর্ষ। কিন্তু এর মধ্যে ও বিশেষভাবে একটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজকে আপন সমাজ বলে মনে করতে পেরেছেন, আধুনিক ভারতীয় তাঁর সাহিত্যের দর্পণে এমন প্রমাণ প্রতিফলিত করতে পারেনি। ভারতে এত সমাজ সংস্কারের আন্দোলন হয়ে গেল, কিন্তু আদিবাসী সমাজকে নিয়ে নয়। এ বিষয়ে যে কিছু কিছু করণীয় দায়িত্ব আছে তা মাত্র সম্প্রতি রাজনৈতিক উদারতাবাদের জন্য কিছু কিছু দেখা দিয়েছে।"[১৩]

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যিক পরম্পরা অজস্র গৌরবশালী সম্পদে পরিকীর্ণ। বহু বিদুষী রমণীর অবদানে প্রাচীন ভারতের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে নানা ভাবে। বিদুষী রমণীদের ভিতর থেকে যে চারটি নাম বৈদিক ভারতের মুখ উজ্জ্বলতা দিয়ে সমাকীর্ণ রাখতে নিয়ত প্রয়াসী থেকেছে তাঁরা হল ঘোষা[১৪], লোপামুদ্রা[১৫], মৈত্রেয়ী,[১৬] এবং গার্গী[১৭]। তাঁদের প্রত্যেকের পাণ্ডিত্যের গভীরতায় হাঁ-বৈদিক ভারত শ্লাঘা বোধ করে। হাঁ-বৈদিক ভারত মানে আর্য ভারত। আর্যভারত মানে বেদোত্তর কালের ভারত। বেদ লেখা হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। অনার্য সভ্যতার অব্যবহিত পরে। অজস্র মুনি ঋষিদের অবদানে বেদ যেমন তার গঠন শৈলী অর্জন করেছিল, ঘোষা, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর অবদানও ছিল সাথে।

অজস্র মুনি ঋষির অবদানে অনার্য ভারত ধীরে ধীরে পা রেখেছে আর্য ভারতের আঙিনায়। কাক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা। যে সহস্র মুনি ঋষির অবদানে সাম, ঋক, যজুঃ ও অথর্ব বেদ লিখনের কাজ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে, কাক্ষীবানও ছিল তাঁদের একজন। কন্যা নিয়ত সাহার্য করত পিতাকে। ঘোষার শৈশবে একটি জটিল ব্যাধি হয়। সে আক্রান্ত হয় কুষ্ঠ রোগে। সে জানত কোনও ব্রাহ্মণ কুমার আছে বিয়ে করতে রাজি হবে না তাই

জ্ঞান-তপস্যায় খুব বেশি করে মনোযোগী হয়ে পড়ল। ঋক বেদ লেখার কাজে তাঁর সবিশেষ অবদান স্মরণে রাখার মত। ঋক বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯তম ও ৪০তম সূক্তের স্রষ্টা ঘোষা। দুই সূক্তের প্রতেকটিতে ১৪টি করে ঋক আছে। ৪০-তম সূক্তের যে দ্বিতীয় ঋকটি আছে তার বঙ্গানুবাদ হল "হে অশ্বিদয় তোমরা দিবাভাগে কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কালযাপন কর? যেভাবে বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে অথবা কামিনী তার কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে সেরূপ সমাদরের সাথে কে তোমাদের আহ্বান করে?"[১৮] ঘোষার পিতা কাক্ষিবান এবং পিতামহ দীর্ঘ ৩ মাস। তিন পুরুষ ধরে বেদ লেখার কাজে অবদান যুগিয়েছে ঘোষার পরিবার। সেকালের কবিরাজী চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের কাছে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়েছিল ঘোষা। বিয়েও হয়েছিল এবং একটি পুত্র সন্তান ছিল তাঁর।

বেদ নির্মাণে লোপামুদ্রার অবদানও কিছু কম নয়। সেছিল বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের পত্নী। 'শূর্পণখা' নাটিকায় অগস্ত্যের উল্লেখ করা হয়েছে। বিখ্যাত ব্রহ্মবাদিনী হিসাবে লোপামুদ্রার খ্যাতি ছিল সমধিক। লোপামুদ্রা যেমন বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের ভার্যা ছিল, তেমনি বিখ্যাত পণ্ডিত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ভার্যা ছিল মৈত্রেয়ী। যাজ্ঞবল্ক্য ছিল ভয়ানক শূদ্র বিদ্বেষী। তাঁর লিখিত 'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা' ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে অনেক মজবুত করতে সাহায্য করেছে। "When the reaction against the vedic sacrificial religion gave a stimulus to the philosophyical speculations at about 800 B.C., lady scholars did not lag behind in taking an active interest in the new movement. Yajnavalkya's wife Maitreyi belonged to this class. She was more interested in finding out the way to immortality that than in setting new fashions in dress and ornaments. In the philosophyical tournament held under the auspices of King Janaka of Videha. The subtlesh phytosophycal questions initiated for discussion by the lady philospher Gargi, who had the honour to be the spokesman of the distinguished philosophers of the Court"[১৯]

হাঁ-বৈদিকদের যাজ্ঞিক ধর্মে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে প্রচলিত ছিল পশুবলি প্রথা। এমনকি নরবলিরও ব্যবস্থা ছিল। এই বলি প্রথা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক তৈরি হয় সমাজের মধ্যে। জনক রাজা বেদজ্ঞ আর্য ঋষিদের আহ্বান করে। প্রবল বিতর্ক হল যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর মধ্যে। যাজ্ঞিক প্রথার সপক্ষে দুজনেই যুক্তি প্রদান করল। এবং গার্গীর কাছে যাজ্ঞবল্ক্যের পরাজয় একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা।

গার্গীকে নিয়ে বহু কল্পকথা প্রচলিত আছে। গর্গ মুনির কন্যা গার্গী বেদের অনেক সূক্ত মন্ত্রের রচয়িতা।[২০]

বেদ রচনা কাজে অকুণ্ঠ সাহায্য করার কারণে এবং বৈদিক ভারত গঠনে ঘোড়া, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী ও গার্গীকে নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

এই নিবন্ধ মূলত না-বৈদিক ভারতের মূল নিবাসী কন্যা শূর্পণখাকে নিয়ে। তাঁরা

অবৈদিক বলে জাতিভেদ বর্ণভেদ বলে কিছু জানে না। পশুবলি নরবলির সাথেও পরিচিতি নেই। আর্য-অনার্যের মিলন ভূমি এই ভারতবর্ষ। আগেই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাণ্ডব বৃকোদর আদিকন্যা হিড়িম্বাকে মায়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিয়ে করেছিল। তাদের গর্ভজাত সন্তান মহাভারতের এক পরাক্রমশালী বীর। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল আর্য-অনার্যের মিলন। অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের বেলায় বাধা কোথায়? উঠতি যৌবনে বৈধব্যের একাকীত্ব মুছে ফেলে রামচন্দ্রকে বিয়ে করতে চাওয়ায় অনৈতিকতা কোথায়? যুবক-যুবতীর স্বাভাবিক এক বৈধ শরীর মিলনের চোখ দিয়ে দেখলে অপরাধ তো নেই, বরং শারীর জীবনের চাহিদা পূর্ণ করার মত বিদ্যমান আছে এর মধ্যে। কেউ প্রশ্ন করলে করবে এভাবে যে, স্ত্রী বর্তমান থাকতে পুরুষকে আরেকটি বিয়ে করবার অধিকার কে দেবে? কিন্তু সে কালটা ছিল তো পুরুষের বহুবিবাহের কাল। রামের স্ত্রী সীতা রামের সাথে বনবাসী হয়েছিল। শূর্পণখার প্রশ্ন, আর্য-পুরুষেরা অনেকেই তো বহুপত্নীক। রামচন্দ্র সে যুক্তিতে সায় না দেবার জন্য রামচন্দ্র আধুনিক মানুষ। দেব চরিত্রের বহু ঘোষিত কালিমা থেকে মুক্ত। বেদের কাল থেকে সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতা প্রবলভাবে বিরাজিত ছিল। বাংলার নবজাগরণের সময়ে বিদ্যাসাগরকে কৌলীন্য রক্ষার নামে পুরুষের বহুগামিতা রুখতে প্রবল লড়াই করতে হয়েছে, সে তো আমাদের জানা। রামচন্দ্রের অনৈতিকতা এইখানে যে সে তার ছটিভাই লক্ষণের কাছে যেতে বলেছিল শূর্পনখাকে। আবার লক্ষণ যখন নাক-কান কেটে শূর্পণখার প্রবল শাস্তি দেয় তাও নারীনির্যাতনের দোষে দুষ্ট হয়। কোনও নারীবাদী চিন্তক লক্ষণের অপকর্মের সাথী হবে না। তাকে নৈতিক সমর্থনও জানাবে না।

না-বৈদিক কন্যা শূর্পণখাকে নিয়ে নাটিকার আলোচনা সাপেক্ষে নানা দিক থেকে নানা কথা এসেছে। আমার এ আলোচনায় বোধকরি নারীবাদ হয়ে উঠেছে ভারতের উজ্জ্বল মুখ। ভারতের নারী সমাজের একটা বড় দুর্ভাগ্য এখানে যে, যে বেদ রচনায় নারীরা বহু অবদান যুগিয়েছে, ভারতের পুরুষতন্ত্র সেই বেদ পাঠে বঞ্চিত করেছে নারীদের। পুরুষতান্ত্রিকতা নারীদের প্রকাশ্যে বেদ পাঠের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। আমার একটা ঘটনার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সন তারিখ মনে নেই। কলকাতায় একবার একটা প্রকাশ্যে বেদ পাঠের বড় অনুষ্ঠান হয়েছিল। অনুষ্ঠানে পাঠ কার্যের জন্য আহুত হয়েছিল অরুন্ধতী হোমচৌধুরী। নামী সঙ্গিত শিল্পী। ওই অনুষ্ঠানে পুরীর শঙ্করাচার্য ছিল সভাপতি। তাঁকে বলতে শোনা গেল, একী সর্বনেশে ব্যাপার? নারীদের তো বেদ পাঠের অধিকার সম্পর্কে দেওয়া নেই। শঙ্করাচার্যের নির্দেশে অরুন্ধতী হোমচৌধুরীকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে হয়েছিল।

আমার এ নিবন্ধ মূলত না-বৈদিক ঘরের কন্যা শূর্পণখার হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা এক অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা নিয়ে। আমার এ আলোচনা মূলত হাঁ-বৈদিকদের হাতে না-বৈদিকদের শরীর নির্যাতন নিয়ে। ভারতবর্ষের একই নৃ গোষ্ঠীর মানুষ একদল আরেক দলকে বলে রাক্ষসী, দস্যু, বর্বর, হনুমান? কে এমন অভিধায় অভিহিত করে। শুনলে

অবাক হতে হয় সেটা আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থ বেদ। হাঁ বেদ। হাঁ তাঁরা হাঁ-বৈদিক। এই সাপেক্ষে একটা শ্লোকের উল্লেখ করি :

অকর্মা দস্যুরভি নো অমরন্ত নারতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহস্ব ধর্মদাসস্য দম্ভয়।।[২১]

বিমদ ঋষির এই ঋকে বলা হয়েছে, 'আমাদের (আর্যদের) চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞ কর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মানুষের মধ্যেই নয়, অমানুষ। হে শত্রু সংহারকারী! তাদের নিহত কর। সে দাস জাতিকে হিংসা করো।'

বেদের এই নির্দেশের অনুসারী হাঁ-বৈদিকদের সকলেই তো তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করে। তাই তারা বেদের অনুবর্তী হয়েইতো ন-বৈদিকদের ওপরে অত্যাচার করে, করে শারীরিক নির্যাতন। লক্ষণ তো হাঁ-বৈদিক। শূর্পণখা তাঁর নারীর মর্যাদা চাইলে সে তা পায় না। পাবেই বা কেন? ঋক বেদে মনুর উল্লেখ আছে ৯ বার। অসুরদের কথার উল্লেখ আছে ১১ বার। মনুর কথায় 'নাস্তিকঃ বেদনিন্দকঃ'। ২২ বেদের যারা নিন্দা করবে তারা নাস্তিক।

বেদের এই নির্দেশের অনুসারীদের কাছে শূর্পণখার দুই কর্ণ ও নাসিকা ধারাল অস্ত্রের কোপে ছেদিত হলে তার জন্য হাঁ-বৈদিকদের কারো মনে কোন দুঃখ স্পর্শ করে কি? বরং দোষী সাব্যস্ত হয় যৌবনে স্বামীহারা এক বেদনা বিধুর মানবী-কন্যা। অনার্যের ওপর শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক শোষণ আর অত্যাচার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এই ভারতবর্ষে। যে ভারতে জাতিভেদ ছিল না, বর্ণভেদ ছিল না, আর্য-অনার্যের দীর্ঘ কালের এক মিলন ভূমি; যেখানে আর্যদের দেবতা অনার্যের দেবতায় পরিণত হয়েছে, আবার পক্ষান্তরে অনার্যের উপাসনার বহু দেব-দেবীকে আর্যরা আপন করে গ্রহণ করেছে। সেখানে শূর্পণখার ওপরে সেকালের সেই শরীর নির্যাতন একালে আর্য-অনার্য নির্বিশেষে সবার কাছে বেদনা সঞ্চার করে। এবং করাও উচিত।

দন্ডকারণ্যের জঙ্গল মধ্যে বিচরণ করতে করতে রাজকুমার এবং সুদর্শন যুবক রামচন্দ্রের সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায় শূর্পণখার। যৌবনে বৈধব্যের যন্ত্রণায় ব্যথাতুর যে নারী। হোক্ সে অনার্যা, তার হৃদয় তো মনুষ্য হৃদয়। প্রেম আর ভালোবাসার ভুবনে যে হৃদয় ব্যর্থ-বাতিল হয়ে গেছে, নতুন করে বাঁচার ভুবন নির্মাণের স্বপ্ন সে তো দেখতেই পারে। কিন্তু বেদের নির্দেশ, "আর্যদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞ কর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী! তাদের নিধন কর।' অনার্যরা একই দেশের হাওয়া-জলে কতোকাল এই নিষ্ঠুর ভাবনার উত্তরাধিকার বইবে? "অবদমিত শ্রেণী বলে চিহ্নিত করে শিক্ষা ও চাকরী সংক্রান্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করল, তাদের সামাজিক সুবিধার জন্য। এর ফলে তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলির মধ্যে সৃষ্টি হল এক নতুন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চেতনা।"[২৩] এ নিবন্ধ মূলত সেই সৌম্যদ্যুতি সরস পথের যাত্রা।

ড. বি আর আম্বেদকর তাঁর Riddles in Hinduism গ্রন্থে রামচরিত্র নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছে। চৌদ্দ বছর বনবাস পালনের পর অযোধ্যাধিপতি হয়ে রাম এক ভিন্ন পুরুষ হয়ে উঠেছে। ড. আম্বেদকরের বর্ণনায় পাই, "Sita abandoned by Rama and left to die in a jungle went for shelter in the Ashrama of Valmiki which was near about. Valmiki gave her protection and kept her in his Ashram. There in course of time Sita gave birth to twin sons, called Kusa and Lava. The three lived with Valmiki. Valmiki brought up the boys and taught them to sing the Ramayana which he had composed. For 12 years the boys lived in the forest in the Ashram of Valmiki not far from Ayodhya where Rama continued to rule. Never once in those 12 years the model husband and living father cared to inquive. What had happened to Sita whether she was living or whether she was dead. Twelve years after Rama meets Sita in a strange manner. Rama decided to perform a yadna and issued invitation to all Rishis to attend and take part. For reasons best known to Rama himself no invitation was issued to Valmiki although his Ashram was near to Ayodhya. But Valmiki came to the Yadna of his own accord accompanied by the two sons of Sita introducing them to disciples. While the Yadna was going on the two boys used to perform recitations of Ramayana in the presence of the Assembly. Rama was very pleased and made inquiries when he was informed that they were the sons of Sita."[২৪]

নারীবাদের পণ্ডিতেরা সীতার সহিত রামের আচরণ আমাদের এই ভারতবর্ষে নারীবাদের মুখ কতটা গরিমাময় করে তুলতে পারবে তা জানা নেই আমাদের। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রশক্তির ভিতরে এই মুহূর্তে কোথাও কোনও কার্পণ্য নেই, তারা রামরাজত্বের মধ্যে চূড়ান্ত এক শক্তি খুঁজে পেতে ব্যস্ত। তারা গরিমার এক মহৈশ্বর্য আবিষ্কার করেছে রামমন্দির নির্মাণের সাফল্যের মধ্যে। রাষ্ট্র শক্তির কথা রবীন্দ্রনাথের গভীর চেতনার আলোকে অনেকখানি হতাশ করেছে আমাদেরকে। "রাষ্ট্রনীতিতে মহত্বলাভ আমাদের পক্ষে সর্বপ্রকারে অসম্ভব। সেই পথে আমাদের সমস্ত মনকে যদি রাখে, তবে পথের ভিক্ষুক হইয়াই আমাদের চিরটাকাল কাটিবে। যে-শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় সে-শক্তি আমাদের নাই, লাভ করিবার কোনো আশাও দেখি না।"[২৫] আসলে ধর্মের অনাবশ্যক মোহ এবং যে মোহ এই মুহূর্তে প্রাবল্যে প্রধান শক্তিধর, তা কেবল আমাদের সর্বতোভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রাখে আর মারে কেবল।

ভারতবর্ষ চিরকাল বৈচিত্র্যের মধ্যে সন্ধান করেছে ঐক্যের। অনাহারী, অর্ধাহারী, অশিক্ষিত, শিক্ষিত সবাইকে নিয়ে আমাদের এই ভারতবর্ষ। মাত্র কিছুদিন আগে প্রবল করণার অতিমারীর মধ্যে আমরা আমাদের একজন প্রিয় কবি সিদ্ধালিঙ্গাইয়াকে হারিয়েছি।

বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্নড় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিল সে কবি। এক কবিতায় বলতে শুনেছি এই কবিকে — Who die of starvation, who are kicked till they faint, who cringe before others, reaching out to hands and yeet who keep their hands tolded, devotees of those above them These, these are my people.[২৬]

শূর্পণখা এই জনগোষ্ঠীর মানুষ হয়েও সে তো ছিলো রাজ-দুহিতা। দারিদ্রের ছায়া তাঁকে ছোঁয়নি কখনো। নাটিকাটি তার পাঠকদের ভিন্ন এক জ্ঞানমার্গে নিয়ে যায়। যারা এদেশের মূলনিবাসী জঙ্গলের মানুষ তাদের কেউ কেউ যেমন রাজ্য শাসন করে, তাদের কেউ কেউ হয়ে ওঠে কবি — বাল্মীকির মত মহাকবি। যে এককালে ছিল জঙ্গলের ডাকাত, দস্যু কিংবা পথচারীর সম্পদ ছিনতাই কর্মী, পরিচিত ছিল রত্নাকর দস্যু নামে; গভীর এক নিরলস সাধনমার্গের অবিরাম স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হবার তপস্যা নিয়ে এমন এক মহাশক্তি জড়ো হল তার মধ্যে, কাব্য-সাহিত্যের আদি শ্লোক শোনা গেল তাঁর সুললিত কণ্ঠের আচরণে:

মা নিষদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমশাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথু নাদেকম্ বধীর কামমতিম্।[২৭]

নিরক্ষর জীবনের শেষপ্রান্ত থেকে জ্ঞানের জগতে প্রবেশের জালে একটি বিশেষ শব্দ গেঁথে গিয়েছিল মনন জগতে। রাম। সেই রামকে প্রধান চরিত্র করে কবি লিখেছিল রামায়ণ মহাকাব্য। এই মহাকাব্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট উক্তি:

"কবি তব মনোভূমি, রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন।"[২৮] যা ছিল কবি কল্পনার এক নিশ্চিত বিষয়, তা এখন ইতিহাসের এক পাথুর প্রমাণ হতে চায়। আমার ভিতরে এই সময়ে একটি প্রশ্ন জাগে, ভারতীয় অতি সাধারণ নাগরিক পাঠক সমাজে, এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বজ্জন পাঠক সমাজেও হাঁ-বৈদিকদের না-বৈদিক সমাজের মানুষদের না-মানুষ ভাবা রাক্ষস, দস্যু, হনুমান, বানর, দাসানুদাস ইত্যাদি ভাবা আর কতোদিন চলবে? ভারতীয় নারী সমাজকে 'দাসস্য দাসী বলা কবে থেকে মানবি সচেতনতায় অঙ্গীকার করা হবে?

'অন্য এক শূর্পণখা' স্বল্পাঙ্গ নাটিকায় জনম দুঃখিনী সীতাকে আমরা পেয়েছি। স্বামী সোহাগে বঞ্চিত এক যন্ত্রণা কাতর নারী হিসাবে। সন্তান সম্ভবা পত্নীকে রাজপুরী থেকে কিয়দ্দুরে এক মুনির আশ্রমে রাখা হয়েছে এমন এক মুনি যার উজ্জ্বল বংশ গরিমা ছিল না কিছু। দুটি যমজ সন্তানের জন্ম দেবার পর বার বৎসর কাল স্বামী কোনও খোঁজ নেয়নি তার। এক তাঁরই মুখ নিসৃত নিস্যন্দ কথন: "ধন্য এই অনার্য অরণ্যবাসী যার মনে কোন হিংসা নেই। ভালোবাসায় কোন স্বাদ নেই। নিঃস্বার্থ ভালোবাসাপূর্ণ এদের হৃদয়। রাজপুত্রবধূ হয়েও যে সম্মান, যে শ্রদ্ধা আমি পাইব যা এরা আমাকে দিয়েছে সেই সম্মান, দিয়েছে মায়ের মতো শ্রদ্ধা। এত শুনেছি, মায়ের ঋণ নাকি শোধ করা যায় না। মিথ্যা, সব মিথ্যা এদের মতন সন্তানের ঋণ কোন মা শোধ করতে পারে? জীবনে মায়ের স্নেহ কোনদিন

পাইনি। কে আমার মা? সে কি এই অরণ্যবাসী মায়েদের মতই। জন্মলগ্নে আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, বা করতে বাধ্য হয়েছিল। যে মা, কে সে? সে কি আজও আমার জন্য নীরবে অশ্রু পাত করে? সে কি আর্য, নাকি অনার্য? আমার শরীরে, কি আর্য শোণিত, না কি অনার্য শোণিত। জানি না, কিন্তু কেন যেন অনুভব করি, খাঁটি আর্য শোণিত আমার ধমনীতে থাকতেই পাবে না। তা না হলে এই অনার্য জাতির প্রতি আমার কেন এই স্নেহাকর্ষণ এরাই বা কেন আমাকে ভরিয়ে দেয়, অনাবিল অপত্য স্নেহে?" রামচন্দ্র ভগবান নয়। কবি কল্পনার একটি মানব চরিত্র। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে সম্বোধন করে স্পষ্ট বলেছে 'কবে তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান', অযোধ্যার মেয়ে সত্য যেন'।

অযোধ্যা যে শ্রীরামের জন্মভূমি দীর্ঘকাল ধরে তা বিতর্কের ভূমিতে অবস্থান করেছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য বাল্মীকির রামায়ণ আবার নতুন করে পাঠ করে লিখেছে তাঁর বাল্মীকির রাম ফিরে দেখা? পুস্তিকা। আজ যখন 'রামরাজ্য সম্বন্ধে একটা স্বপ্নকে পুনর্বার কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করার একটা উদগ্র চেষ্টা হচ্ছে এ দেশের লোক মানসে, তখন যেন আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি : নারী শূদ্রের ওপর অত্যাচার যে তন্ত্রে অপরিহার্যভাবে গৃহীত, যেখানে ধর্মাকাঙ্খী শূদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে বাধ্য হয়, নিষ্পাপ অন্তঃসত্বা নারী অকারণে যেতে বাধ্য হয় নির্বাসনে দেওরালী — আড়ওয়ালের পরও আমরা কি সেই রাজতন্ত্র চাই? এরই নায়ক কি 'মর্যাদা পুরুষোত্তম'? অর্থাৎ পুরুষের, সর্বোত্তম আদর্শ অসহায়কে বিপন্নকে ও নারীকে রক্ষা করাই তো এতদিন আদর্শ পুরুষদের অবশ্য করণীয় ছিল, তাকে বর্জন করে যে রাজতন্ত্র, কি আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য না?"[২৯]

নারীবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছিল উমা চক্রবর্তী। নারীবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করত নিয়মিত। তাঁর কথায়: "To understand the relationship between the class and caste it is therefore important to recognize the two hierarchies are operative in Indian society : one according to ritual purity with the brahmana on the top and the `untouchables' at the bottom, the other according to the political and economic status with the landlords at the top and the landless labouress at the bottom."[৩০] এই কথাগুলি একজন সাধারণ মানুষের হৃদপিণ্ডকে যে ধাক্কাটি দেয়, তা মনে হয়, আর্যদের বেদ নামক গ্রন্থের সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে শিকড় গেড়ে বসেছে ভারতীয় সমাজে।

বর্ণশ্রেষ্ঠদের দ্বারা বর্ণশ্রেষ্ঠদের সর্ববিধ স্বার্থ সুরক্ষিত করবার প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেদ। আর্য ভারত বা বৈদিক ভারত বলতে ভারতের উত্তরের দিকের আর্যাবর্ত বোঝায় ঠিকই। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম দিকেও একই ধারার বইয়ে দেবার কাজ অনেক-পাকাপোক্ত। বিশেষ করে গুজরাটে হিন্দুত্বের শিকড় বিস্তার করেছে অনেক গভীরে। সেই হিসাবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে তামিলনাড়ু বেদ-বিরোধী আন্দোলনের শীর্ষে অবস্থান করে। তাদের বেদবিরোধী মনস্কতা অনাদিকালের। পরিবারের আন্দোলন, আন্নাদুরাইনের

আন্দোলন, আইওথী থাসের আন্দোলন প্রণিধান যোগ্য। তামিলনাড়ুর কথা বলা হয়েছে এভাবে: "Some others, historians in particular, wished to know more of that constellation of factors and events, which rendered anticaste radicalism successful in some parts of the state and not in others. Yet others wondered at the relation between anti-caste radicalism and Tamil nationalism, and whether there was and could be an easy fit between the two."[৩১]

তামিল ভাষাভাষি মানুষের চেতনার জগতটা যেমন না-বৈদিকতার শর্ত পালন করেছে মন-প্রাণ দিয়ে, বাতথঙলায় ও সেই ঢেউ আছড়ে পড়েছিল শ্রী শ্রী হরি গুরুচাঁদের মতুয়া আন্দোলন দিয়ে। হরিচাঁদ স্পষ্ট করে বলেছিল 'না মানি বেদ, না মানি ব্রাহ্মণ। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ চেতনা যুগিয়েছে প্রতিষ্ঠান ভাবে। দেশ-স্বাধীনতার আন্দোলন দিয়ে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদকে আরও শক্তিশালী করতে নিপীড়িত মানুষের অনাদিকালের বঞ্চনার সুরাহার কোনও পরিকল্পনার স্থান ছিল না তাদের মধ্যে। কংগ্রেসের এক মহীরুহ নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ দলিত সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেবার আবেদন জানিয়ে পত্র লিখেছিল গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে। তার প্রত্যুত্তরে গুরুচাঁদ বলেছিল, "স্বদেশী আন্দোলনে আমরা যোগ দিতে পারি তার আগে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় খোলা হোক, তাদের দারিদ্র মোচনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক'।[৩২]

ঠিক একইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল তামিল নাড়ুর পারাইয়ারা অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের নেতা আইওথী থাস। তাঁর কথা : " For Iyothee Thass, Swadeshi activities seemed suspect and undesirable for a number of interrelated reasons. His primary objection to Swadeshi and swaraj was directed against the conduct of the brahmin proponents of nationalism. He enumerated several instances of discrimination and prejudice exhibited, not only by the brahmin owned press and brahmin publicist who mediated and constracted public opinion. Iyothee Thass often resorted to parabli like narratives to indicte the dubions origins and associatious of the nationalist idea."[৩৩]

দীর্ঘকাল বেদ নিয়ে কাজ করেছিল ড. ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁর কথা খুবই স্পষ্ট, "কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুর বর্তমান অবস্থাকে সনাতন ভাবিয়া অনেকে উহা কায়েমী করিতে চাহেন এবং মনে করেন যে এই অবস্থাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে। তাহারা বর্তমানের সামাজিক অবস্থাকে শাস্বত ভাবিয়া বেদে দেখিতে চাহেন।"[৩৪]

ভারতের প্রায় সকল আন্দোলনের শীর্ষে থাকাদের দেখা গেছে বর্ণদোষে দুষ্ট থাকতে। এমনকি ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন যারা করেছে তারাও তাই একই দোষে দুষ্ট থেকেছে। বিশেষ একটা উক্তির কথা মনে পড়ে। "our communist leadership has come

to know that only through Marxism it is possible to maintain the caste status in India. That is why more and more brahmin youths are turning Marxist. The clamour of economic criterion to decide 'backwardness' and not caste comes from this section of Marxists." 35

যারা সাম্যবাদী আন্দোলন করে থাকে। আরো সোজা কথায় যারা এই মুহূর্তে মার্কসীয় ভাবনার অনুসারী, তাদের মধ্যেও জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রবলভাবে কাজ করে থাকে। মার্কসবাদী ব্রাহ্মণ পিতা তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য মার্কসবাদী ব্রাহ্মণ পাত্রের খোঁজ করে। আমাদের উভয়েই বৈদিকতায় বিশ্বাসী, উভয়েই হাঁ-বৈদিক। একটু আগেই আলোচনা করেছি তামিলনাড়ুর না-বৈদিক মননের কথা। ভারতবর্ষে যারা হাঁ-বৈদিকতার প্রবল জোয়ার এনেছে, ভারতবর্ষকে হাঁ-বৈদিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, তদের প্রবল শক্তিধর সংগঠন রাষ্ট্রীয় সয়ং সেবক সংঘ। কোনও এক সময়ে এই সংগঠনে প্রধান ছিল এস এস গোলওয়ালকর। তামিলনাড়ুর না-বৈদিকদের খুব একটা পছন্দ নয় তাঁর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "These days we are hearing much about Tamil. Some protagonists of Tamil claim that it is a distinct language altogether with a separate culture of its own. They disclaim faith in the Vedas, saying that Tirukkural is their distinct scripture. Tirukkural is undoutedly a great scriptural text more that two thousand years old." [৩৬] এটাই প্রমান দেয় প্রাচীন ভারত না-বৈদিক।

যে বেদ তার উদর থেকে প্রসব করেছ বৈষম্যের চেতনা, প্রসব করেছে জাতিভেদ বর্ণভেদ, যে জনগোষ্ঠীর মানুষ সেই বৈষম্যের যন্ত্রণায় বিহ্ব হচ্ছে আজীবন; তারা সেই বেদকে আপন হৃদয়ের ভালোবাসার সম্পদ বলে গ্রন্থ লিখে হাবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক সম্পর্কে দলিতের অবস্থান জানিয়ে দিল সারা বিশ্বকে। তার কথায় "Indian caste society has wilhingly embraced its violent and toxic ethos. Deep hatred of the others is afuel for survival India has been unleshing caste terroreism upon 'lesser' defemed bodies since the advent of Vedas sponsored casteism" [৩৭] কাদের পরে অত্যাচারটা বেশি বেশি করে হয়ে থাকে তাও আমাদের জানার বিষয়। মানবিক অবমাননার গ্লানিকর দ্যুতি দিয়ে গতি হয় নিম্নপেশায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শ্রমিক-কৃষক-মাথায় করে মানুষের বিষ্ঠা বাহকেরা। বাড়ির উঠোনে দাঁড়াবার মানুষের অধিকারে বঞ্চিত অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী বনে জঙ্গলে গিয়ে জ্বালানী সংগ্রহকারীরা। কাদা জঙ্গলে ঘেমে নেয়ে সদা পরিশ্রম করে মৎস শিকার করে সংসার চালান যারা। ড্রেন, পাতকুয়ার নোংরা সাফাই করে জীবিকা নির্বাহ করে যারা। মানুষের সমাজে না-মানুষের অভিধায় রাখা আছে এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ। আর্যামির অহংকার নিয়ে তার দিকে ফিরে তাকাবার সুযোগ হয় না তাদের। জীবন-যন্ত্রনায় দগ্ধ হওয়া ওই মানুষদের কানে ভালো লাগার কথা নয় এবং

ভালো লাগে না। বর্ণের বিচারে তারা, জাতির বিচারে তারা হিন্দুত্বের অঙ্গনের যন্ত্রণা ভোগকারী শূদ্র এবং অতিশূদ্র। ভারতবর্ষে শ্রেণি আর বর্ণ যে এক ছাতার তলে বাসা করে সাম্যবাদীরা তা বুঝতে বড় দেরি করেছে। দু'একটি ব্যতিক্রম যা থাকে সেটাই তাঁদের কাছে মুখ্য প্রমান হয়ে দাঁড়ায়। এবং বর্ণাধিপত্য বাঁচিয়ে রাখার কাজে সদা প্রয়োজনীয়।

"In addition to this, the ignorance, silance and appropriation of caste issues by non-Dalit twomen has led to the problematics of the touch monument – the precise movement of realizing the missed part. In addition to the representation of middle educated Dalit women on various platforms, the question of class and gender places important emphasis on the mandate of Dalit librates Friedrich Engels has argued in his famous thesis 'The origin of the family, private property and the state' that the issue of gendered subjugation and subordination is primerity class oriented." [৩৮] ড. বি আর আম্বেদকরের থেকে আর মাত্র কয়েকটি কথা ধার করে নিয়ে আমার এই না-বৈদিক, হ্যাঁ-বৈদিকদের ইতিকথা নিধনটা শেষ করুক। ভারতীয় সমাজের বেদ-ভিত্তিক বর্ণাধিপত্য যে অনন্তকাল ধরে সমতার অন্তরায় হয়ে কাজ করে যাচ্ছে—আর্য প্রাধান্য অনার্যদের করেছে কোনঠাসা, মানুষদের বিকাশ তা নিয়ে সর্বতোভাবে ব্যহত করেছে। একথাই মূল কথা।

বৈদিক ভারতের বিজ্ঞান-বিকাশের গরিমায় কেউ কেউ বেশ শ্লাঘা বোধ করেছে। গরুর দুধের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেয়েছিল সোনা, ময়ুরের অশ্রু দিয়ে গর্ভ ধারণ সম্ভব হয়েছিল, শল্য চিকিৎসক গণেশের মাথায় হাতির মাথা যুক্ত করে দিয়েছিল প্লাস্টিক সার্জারির ব্যবহার করে অথবা সীতা আকাশ পথে ভ্রমণ করেছিল পুষ্পক রথে। এসব কথার বিস্তার বেদের থেকে এসেছে এমনটা জানা নেই। অথচ বেদ বিশ্বাসীদের মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে বার বার। বেদ মূলত প্রাচীন ভারতের সামাজিক গঠন পদ্ধতির বই। অশ্লীলতা ও পরিদৃষ্ট হয় তার সূর্য-পুষণ ভাষ্যে (ঋক বেদ ১০/৮৫/৩৭) অথবা ইন্দ্র-ইন্দ্রানী ভাষ্যে (ঋক বেদ ১০/৮৬/৬) অথবা যজুঃবেদের অশ্বমেধ অংশে। "The vedas may be useful as a source of information regarding the social life of the Aryans."[৩৯] এক কথায় বেদ ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে হাঁ-বৈদিকদের কাছে।

হাঁ-বৈদিক না-বৈদিকদের ভিতরকার বিভেদ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ড. আম্বেদকরের চিন্তা ও চেতনায়। হাঁ-বৈদিক না-বৈদিক একই মনুষ্য গোষ্ঠী। অথচ চিরকাল দূরে দূরে থেকেই ভেবেছে মিলনের শ্বাসরোধক কথা। "The difference between the Aryans and the Non-Aryans was cultural and not racial. The cultural difference centred round two points. The Aryans believed in Chaturvarna. The Non-Aryans were opposed to it. The Aryans believed in the performance of Yajna as the essence of their religion. The Non-Aryans were opposed to Yajna. Examining the story of

Daksha's Yajna in the light of this facts it is quite obvious that Siva was a Non-vedic and Non-Aryan God."[৪০]

এ নিবন্ধ এখানে শেষ করে দিলে আর্য-কৌলীন্যে একটা বড় সংশয় তৈরি হয়েছিল। অনার্যের দেবতা শিবকে আর্যদের গ্রহণ করার পিছনে তাদের নিজস্ব একটা যুক্তি আছে। কি সেই যুক্তি? " The Brahmins had developed the theory of Avatar which holds that God when necessary in carnates into different forms, human or animal. This they use for two fold purpose, firstly to elevate the supremacy of a God in whom they are interested and secondary to reconcile the conflict between Gods and different personalities."[৪১]

শিব বা মহেশ্বর অনার্য বা অবৈদিক ছিল বলে দক্ষ যে বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিল তা সমূলে পন্ড করেছিল শিব বা মহেশ্বর। অনার্যরা যাগ যজ্ঞ করত না। অনার্য ভারতে আর্যদের আগমনের পরে অর্যকরণের কাজ শুরু হয়েছিল ধীরে ধীরে। বৈদিক ভারতে ব্রাহ্মন্য ধারার প্রতিষ্ঠার এক প্রবাদ পুরুষ তো ছিল মনু। বেদের মধ্যে যে সুর ছিল তা আরও বহুগুণ চড়া করে প্রয়োগ করা শুরু করেছিল মনু। শূদ্র ও মহিলাদের জন্য যত প্রকার নিয়মের কথা বলা সম্ভব মনু তা লিখে গেছে অকপটে। মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেছিল দক্ষ। দক্ষের কন্যা সতীর বিবাহ হয়েছিল শিবের সাথে। এক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁর যাগযজ্ঞে বিশ্বাস না থাকার কারণে সতীর সামনেই পিতা দক্ষ নিন্দা করেছিল মহেশ্বরের। পতি নিন্দা শুনে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় সতীর। স্ত্রীর মৃতদেহ স্কন্ধে করে প্রবল প্রলয় নৃত্য করে শিব। এর দ্বারা দক্ষের যজ্ঞ পন্ড হয়ে যায়।

অনার্য আর আর্যের সংঘাত এবং মিলন দিয়েই ওই ভারত এতক্ষনে বিভিন্নদিক থেকে অনার্য কন্যা শূর্পণখাকে সামনে রেখে যে আলোচনার দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়েছে তার নৈতিক মূল্যের কথা আমাদের জানার প্রয়োজন। যে কোন একজন মানুষকে অবমূল্যায়ণ করলে তার অন্তরে দাগা লাগে, মনে কষ্ট হয়। রক্ত মাংসের মানুষকে রাক্ষসী বলা, দস্যু বলা কোনও প্রকার সভ্যতার ভব্যতার পরিচায়ক নয়। কাউকে অমানুষ বা না-মানুষ ভেবে নেওয়াটা একটা মস্ত অপরাধ। ভারতীয় সমাজের মানুষের মনন রাজ্যের বদল ঘটুক সেই প্রত্যাশা নিয়ে এই আলোচনা। বেদকে মহান গ্রন্থ বলে ভাবা যায় কি তাও বোঝা দরকার। প্রতিটি মানুষের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যাওযার কথা। এদেশের জাতিভেদ বর্ণভেদ কোনও প্রকার যুক্তি দিয়ে সমর্থন করার মানুষের অভাব নেই। একাদশ শতকের আগে পর্যন্ত এবং স্পষ্ট করে আলবেরুনী ভারতে আসার পরেই তো 'হিন্দু' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন 'ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো।' অথচ সেই ধর্মের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে শেষ হয়ে যেতে চাই। এই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি হোক।

হিন্দুরা যারা শিবের পূজা করে তাঁদের বোধকরি অনেকেরই একথা জানা নেই যে শিব অনার্য-দেবতা। "The Hindus are not aware that Shiva is a Non-

Vedic, Non-Aryan God."[৪২] বেদে যাঁকে রুদ্র বলা হয়েছে তাকেই তো মেনে নেওয়া হয়েছে শিব বলে। এদেশে আর্য-অনার্যের বিচারে মানুষ সাদা, মানুষ কালো। 'কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ'। তার ভিতরে মনুষ্যত্বের খোঁজ করাই মানুষের ধর্ম।

প্রসঙ্গসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী (প্রকাশিত), ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা — ১৭, বৈশাখ ১৩৯৫, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ — ৭১

২. Sachchidananda Bhattacharya, A Dictionary of Indian History, Calcutta University Publication, 1972, 1st ed. pp 422

৩. ibid pp 637

৪. ibid pp 496

৫. ঋকবেদ সংহিতা, দ্বিতীয় খন্ড, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা - ৭, পৃ ৫৭০

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্য কৃতঃ
উরু তদস্য যদ্বৈশ্য ঃ পড্যাং শূদ্রো অজায়ত।।

৬. বিনয় মজুমদার, বিনয় মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ ৯

৭. সুশোভন সরকার, ইতিহাসের ধারা, মনীষা, ৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, অষ্টম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ ৩৫

৮. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম ও প্রগতি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা - ৯, ১ম সং ১৯৮৩, পৃ ৭৭

৯. সুধীর চন্দ্র সরকার (সংকলিত), পৌরাণিক অভিধান, এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩ ৫ম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯২, পৃ ১৩৩

১০. Neerav Patel, Buzning From Both Ends, Ramesh Chandra Parmar, President Dalit Pankar, Gujrat, 8, Manhar Nagar Society, Ahmedabad 380021. 1st ed. 1980, pp 23.

১১. Sunity Kumar hall, The Origin and Development of the Bengali Languages, Rupa & Co. Calcutta, 1985, Vol – ONE, pp 6

১২. bid pp 46

১৩. সুবোধ ঘোষ, ভারতের আদিবাসী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ ১০

১৪. সুধীর চন্দ্র সরকার (সংকলিত), পৌরাণিক অভিধান, এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স,

২৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, পঞ্চম সং, ফাল্গুন ১৩৯২, পৃ ১৬০
১৫. সুবল চন্দ্র মিত্র (সংকলিত), সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কল - ৭৩, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ১১৯৬
১৬. সুধীর চন্দ্র সরকার (সংকলিত), পৌরাণিক অভিধান, পৃষ্ঠা ৪৩৮
১৭. সুবল চন্দ্র মিত্র (সংকলিত), সরল বাঙ্গালা অভিধান, পৃষ্ঠা ৪৭৫
১৮. ঋকবেদ সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা - ৭, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম সং ২৬শে ভাদ্র ১৩৮৩, পৃ ৮৯৫
১৯. A. S. Alfekar, The Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarashidass Publishers Delhi, 2nd ed. 1959, Reprint 1995, pp 11-12
২০. সুধীর চন্দ্র সরকার (সংকলিত), পৌরাণিক অভিধান, পৃ ১৩৮
২১. ঋকবেদ সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, ভাদ্র ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ৪৮৭
২২. মুরারী মোহন সেনশাস্ত্রী (সম্পাদিত), মনুসংহিতা, দীপালী বুক হাউস, ১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কল - ৭৩, ১ম সং ১৯৮৫, পৃ ২৫, শ্লোক ২/১১
২৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত দাশগুপ্ত, জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, ইন্টারন্যাশনাল ফর বেঙ্গলী স্টাডিস, দিল্লি, ১ম সংস্কার এ, ১৯৯৮, পৃ ১৪
২৪. Dr. B. R. Ambedkar, Dr. Balasaheb Ambedkar writings and speeches, Education Department Govt. of Maharastra, 1987, Vol.- 4 pp - 330
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা - ১৭, ২ বৈশাখ ১৩৯৫, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০৪।
২৬. H. S. Chiva Prakash, K.S. Radhakrishna (editor) A string of pearts, Karnataka sahitya academy. Bangalore 560002, 1st ed. 1990, pp 222
২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ড. আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা - ১৭, ১৪শ খণ্ড, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ৮১৮।
২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ড. আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা - ১৭, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৯০৯।
২৯. সুকুমার ভট্টাচার্য, বাল্মীকিকর রামায়ন ফিরে দেখা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রিট কলকাতা-৭৩, ৫ম মুদ্রণ ২০০৪, পৃষ্টা-২৪।
৩০. Uma Chakrabarti, Gendering Caste Through A Faminist Lens, Street, 16 Southern Avenue, Kol-26, 2nd print, 2009, pp-12.
৩১. V. Geetha and S.V. Rajadurai, Towards a non-Brahmin Millennium from Iyothee Thass to periyar, Samya, 16 Southern

Avenue Kol-26, Sted. 2011, pp-502.
৩২. আচার্য মহানন্দ হালদার, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত, ঠাকুর নগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০০৬ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৬৭-১৭৬।
৩৩. V. Geetha and S.V. Rajadurai, Towards a non-Brahmin Millennium from Iyothee Thass to periyar, Saya, 16 Southern Avenue Kol-26, 2011, pp-60.
৩৪. ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, নবভারত পাবলিশার্স। ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৪।
৩৫. V. T. Rajshekar, A Recipe for Revolution, Dolit Sahitya Akademy, Bangalore-3, 1st ed. 1985, pp-45.
৩৬. M.S. Golwalkar, Bunch of Thoughts, Sahitya Sindhu Prakashana, Bangaluru-I, 1st ed. 2020, pp- 111-112.
৩৭. Suraj Yengde, Caste Matters, Penguin Viking, Penguin Radom House, India, 1st ed. 2009, pp-12.
৩৮. ibid, pp-144-145.
৩৯. Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Balasaheb Ambedkar writings and speeches, Education Department Govt. of Maharastra, 1987, Vol.- 4, 1987, pp - 44.
৪০. ibid, pp-163.
৪১. bid, pp-167.
৪২. ibid, pp-165.